জীবজন্তুর গল্প

সম্পাদনা
শৈলশেখর মিত্র

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

জীবজন্তু নিয়ে কত ভালো গল্পই না বিখ্যাত লেখকরা লিখেছেন। সেই সব গল্প থেকে কিছু গল্প এই সংকলনে নির্বাচিত করা হয়েছে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে এগুলির চেয়ে ভালো গল্প আর নেই। নিশ্চয় আছে — তবে সব গল্পের সন্ধান তো পাওয়া সম্ভব নয় আর সকলের পছন্দও তো এক রকম নয় — তাই বহু লেখকের ভালো লেখা হয়ত বাদ পড়েছে, আবার বহু গল্প হয়ত অনেকের মনের মতো হবে না। কিন্তু একথা সত্যি যে সংকলটি সুন্দর করে প্রকাশ করার চেষ্টায় কোন কার্পণ্য করা হয় নি।

সন্দীপ নায়ক যখন বইটি প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন হাতে বেশি সময় ছিল না, ফলে দ্রুত কাজ শুরু করতে হয়। আমার কাজে আমায় গল্পের সন্ধান দিয়ে দীর্ঘদিনের বন্ধু অশোককুমার মিত্র ও অধ্যাপক বিষ্ণু বসু সাহায্য করেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এতই আন্তরিক যে তাঁদের লিখিতভাবে ধন্যবাদ জানাবার প্রশ্নই ওঠে না।

সন্দীপ নায়ক যেভাবে ছোটদের আনন্দদানের জন্যে নানা ধরনের গল্প নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন তাঁর জন্যে তিনি যে বিশেষ প্রশংসার দাবিদার সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ছোটদের মনে জীবজন্তুরা সব সময় কৌতূহল জাগায়। জীবজন্তুদের তারা আপন ভাবে। তাই জীবজন্তুর গল্পে তারা সহজেই আকৃষ্ট হয় — আনন্দ পায়। তারা আকৃষ্ট হলে এবং আনন্দ পেলে বুঝব সংকলনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে।

শৈলশেখর মিত্র
২৫শে ডিসেম্বর
১৯৯৭

সূচিপত্র

গল্প	লেখক	পৃষ্ঠা
চন্দ্রমুখীর সাজা	শিবনাথ শাস্ত্রী	৭
তোতাকাহিনী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
একটি অন্ধ সীলের কথা	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১৩
গঙ্গাফড়িং	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫
আদরিণী	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৬
দেওঘরের স্মৃতি	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৪
গাধার দাদা	কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত	২৮
আলিপুরের বাগানে	সুকুমার রায়	৩০
বাঘের মাসির গ্রহণযাত্রা	হেমেন্দ্রকুমার রায়	৩২
চিড়িয়াখানার পলাতক	সুবিনয় রায়	৩৫
বুধীর বাড়ি ফেরা	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮
দুটি বুলবুলের কাহিনী	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৪৭
কণিকার জয়	পরিমল গোস্বামী	৫২
ডগি—এ্যলশেসিয়ান নয়	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫
গণেশ-জননী	বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)	৬১
পিন্টু	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৪
ব্যাঙ	জরাসন্ধ (চারুচন্দ্র চক্রবর্তী)	৬৯
ছাগ-চরিত	অন্নদাশঙ্কর রায়	৭২
কুকুর ও বিড়াল	প্রবোধকুমার সান্যাল	৭৪

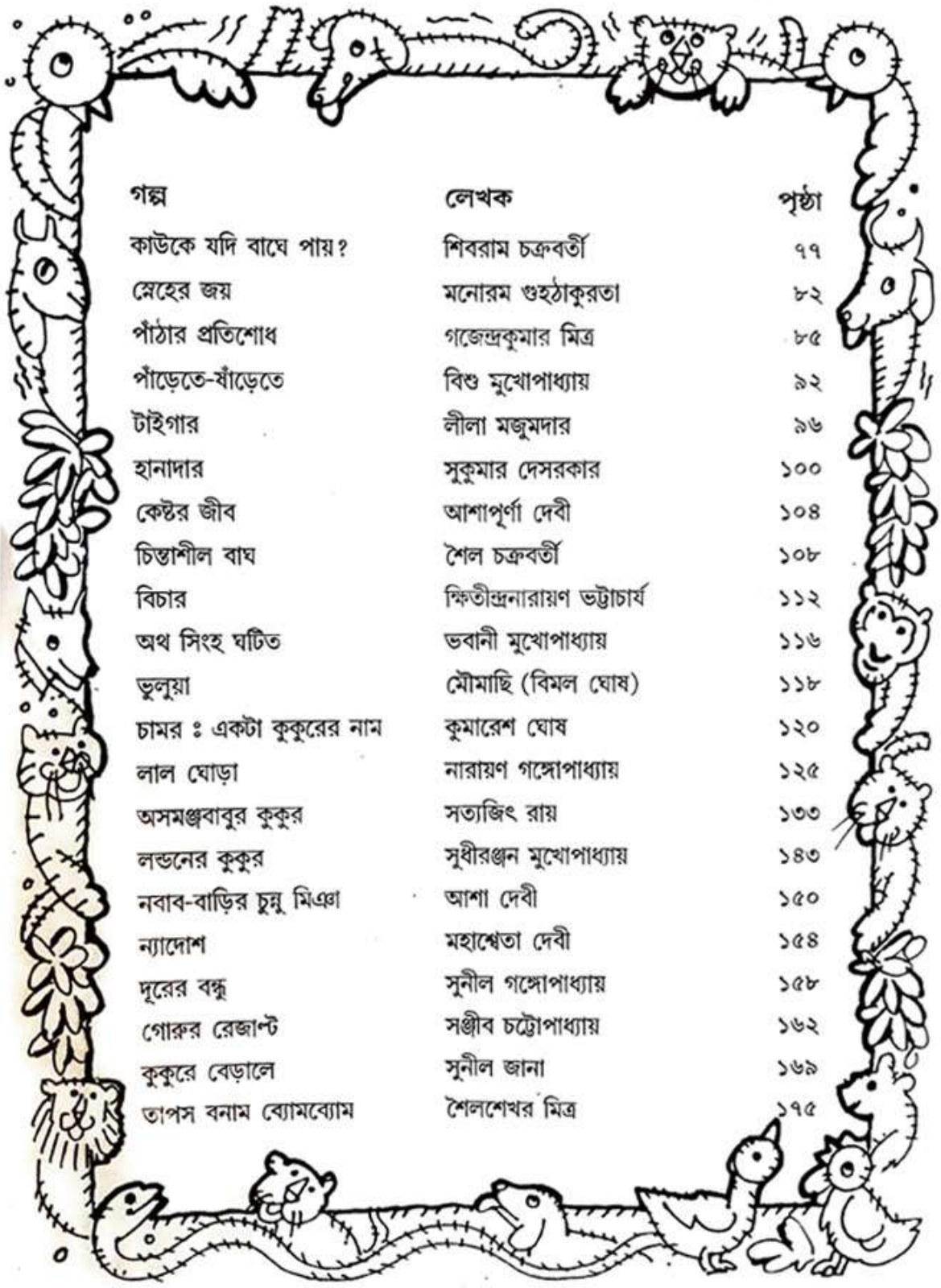

গল্প	লেখক	পৃষ্ঠা
কাউকে যদি বাঘে পায়?	শিবরাম চক্রবর্তী	৭৭
স্নেহের জয়	মনোরম গুহঠাকুরতা	৮২
পাঁঠার প্রতিশোধ	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৮৫
পাঁড়েতে-ষাঁড়েতে	বিশু মুখোপাধ্যায়	৯২
টাইগার	লীলা মজুমদার	৯৬
হানাদার	সুকুমার দেসরকার	১০০
কেষ্টর জীব	আশাপূর্ণা দেবী	১০৪
চিন্তাশীল বাঘ	শৈল চক্রবর্তী	১০৮
বিচার	ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য	১১২
অথ সিংহ ঘটিত	ভবানী মুখোপাধ্যায়	১১৬
ভুলুয়া	মৌমাছি (বিমল ঘোষ)	১১৮
চামর ঃ একটা কুকুরের নাম	কুমারেশ ঘোষ	১২০
লাল ঘোড়া	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১২৫
অসমঞ্জবাবুর কুকুর	সত্যজিৎ রায়	১৩৩
লন্ডনের কুকুর	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	১৪৩
নবাব-বাড়ির চুন্নু মিঞা	আশা দেবী	১৫০
ন্যাদোশ	মহাশ্বেতা দেবী	১৫৪
দূরের বন্ধু	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৫৮
গোরুর রেজাল্ট	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	১৬২
কুকুরে বেড়ালে	সুনীল জানা	১৬৯
তাপস বনাম ব্যোমব্যোম	শৈলশেখর মিত্র	১৭৫

চন্দ্রমুখীর সাজা

শিবনাথ শাস্ত্রী

একজন ভদ্রলোক জানোয়ার পুষিতে বড়ো ভালোবাসিতেন, তাঁহার বাড়িতে তিন চারিটি কুকুর, একটি বানর, দুই তিনটি খরগোশ ও অনেকগুলি বিড়াল ছিল। ভদ্রলোকটির বাড়িতে জায়গা বড়ো বেশি নয়। একটি ছোটো উঠানে তাঁহার পালিত পশুগুলিকে সর্বদাই খেলিতে হইত। সুতরাং তাহারা সকলে একসঙ্গে খেলা করিত। সে বাড়িতে কেহ বেড়াইতে আসিলে, আশ্চর্য হইয়া বলিত, বাঃ! বানর বিড়াল খরগোশে একত্রে খেলাটাতো কখনও দেখি নাই।

সকলের বড়ো কুকুরটির নাম ভুলো। সে একটি প্রকাণ্ড বিলাতি কুকুর, কিন্তু, বড়ো ভালো মানুষ। সে বেচারা তাহার সঙ্গীদের অনেক উপদ্রব সহ্য করে। বানরটি তাহাকে কখনও কখনও ঘোড়া করে তার ঘাড়ে চড়িয়া বসে, কখনও তাহার লেজ ধরিয়া টানে, কখনও তাহার কান মলিয়া দেয়। আবার কখনও বা আদর করে। ভুলো চারি হাত পা ছড়াইয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে, আর বানরটি তাহার উকুন বাছিয়া দেয়; তাহাকে উল্টিয়া পাল্টিয়া পরীক্ষা করে, তাহার তলপেট চুলকাইয়া দেয়, ভুলোর তাহাতে বড়ো আনন্দ। বানরটির নাম মহাবীর। ভুলো মহাবীরের প্রতি বড়ো কৃতজ্ঞ। সে মাঝে মাঝে ভালো খাবার জিনিস পাইলে নিজে না খাইয়া মুখে করিয়া মহাবীরকে আনিয়া দেয়।

বিড়ালগুলির মধ্যে একজন গিন্নি, অন্যগুলি তার ছেলেমেয়ে। তাহারা সেই বাটীতেই জন্মিয়াছে। মহাবীর তাহাদের সকলকেই কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। ছানাগুলি যতদিন ছোটো থাকে, মহাবীর তাহাদিগকে বড়ো ভালোবাসিতেন। সর্বদাই একটি না একটি ছানা বগলে থাকে। ছানাগুলির এমনি অভ্যাস যে, তাহারা মায়ের বুকে যেমন সুখে ঝোলে, মহাবীরের বগলেও তেমনি আরামে থাকে। মধ্যে মধ্যে মহাবীরের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দুধের ঢাকা খুলিয়া ছানাগুলিকে দুধ পান করায়। দুই একবার এইরূপ ধরা পড়াতে তাহার কোমরের দড়ি প্রায় খুলিয়া দেওয়া হয় না। ছানাগুলি বড়ো হইলে

মহাবীরের আর ততটা ভালোবাসা দেখা যায় না। তখন আর দিনরাত্রি বগলে করিয়া বেড়ায় না কিন্তু তাহাদের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি থাকে। তাহারা পরস্পর কামড়াকামড়ি করিলে মহাবীর তৎক্ষণাৎ গিয়া বিবাদ ভাঙিয়া দেয়।

খরগোশগুলি পথে ঘাটে লোহিত বর্ণ-চক্ষু উল্টাইয়া শুইয়া থাকে; বিড়ালের ছানাগুলি তাহাদের লম্বা লম্বা কান লইয়া খেলা করে তাহাতে তাহাদের বিরক্তি নাই। বিড়ালদের গিন্নিও কখনও কখনও আসিয়া খরগোশের গিন্নির কাছে শুইয়া লেজটি নাড়িয়া ছানাগুলিকে খেলা দিয়া থাকেন।

কুকুরদের মধ্যে সকলের ছোটো একজন আছে, তাহার নাম 'পেমা'। সে কিছু লোভী। অন্য সময়ে সে বেশ খেলা করে, বেশ লাফায়, বেশ ছোটাছুটি করে। বিড়ালের ছানাদের মুখের কাছে ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহাদের ছোটো ছোটো হাতের থাবার প্রহার খাইতে ভালোবাসে। মহাবীরের কাঠের ঘরের ছিদ্রের ভিতর মুখের অগ্রভাগ পুরিয়া দিয়া কৌতুক করে। এ সকল বেশ, কিন্তু আহারের সময় সে আর এক মূর্তি ধারণ করে। যখন সে ক্ষুধাতে খেঁকি হইয়া থাকে, এবং আহার করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার নিকট যায় কাহার সাধ্য। দশ হাতের মধ্যে একটা পায়রা চরিতে আসিলে তাহাকে তাড়া করে। তখন তাহারও নিস্তার নাই; ছোট বড়ো জ্ঞান নাই; সকলকেই কামড়াইতে যায়; এই জন্য তাহাকে স্বতন্ত্র খাবার দেওয়া হয় এবং তাহার সঙ্গীদের কেহই তাহার মতো খায় না। বেচারা ভুলো ভালো মানুষ, সে রাক্ষসদের মতো তাড়াতাড়ি নাকেমুখে কতকগুলো গিলিতে পারে না। এইজন্য 'পেমা'র জ্বালায় তাহাকে কখনো কখনো আধপেটা থাকিতে হয়। কোন কোন দিন 'পেমা'র খাবারে পেট ভরে না; সে তাড়াতাড়ি আপনার খাবার খাইয়া ফেলিয়া ভুলোর পাত্র আক্রমণ করে। ভুলো বেচারা যখন দেখে যে ছোটো ভাইটির পেট ভরে নাই, ক্ষুধার্ত হইয়া আসিয়াছে, অমনি মুখটি সরাইয়া লয় ও নিজের খাবার তাহাকে খাইতে দেয়।

এইরূপে কয়জনে সুখে বাস করিতেছে। একদিন কর্তাবাবু একটি সুন্দর বিড়াল আনিলেন। তাহার রূপ অতি চমৎকার। চক্ষু দুটিতে যেন মানিক জ্বলিতেছে, লোমগুলি নরম নরম। গলাতে পুঁতির মালা, পেটের তলাটি মেজেন্টার দিয়ে রাঙানো। দেখিলে বোধ হয় বড়ো সুখী বিড়াল, যেন ননীর পুতুলটি। ভিতরকার কথা এই, সেটি এক আঁটকুড়ো ঘরের বিড়াল। একটি বিধবা স্ত্রীলোক তাহাকে পুষিয়াছিলেন। তাহার আর কেউ ছিল না; সুতরাং দুধটুকু সরটুকু ঘরে যখন যাহা হইত সমুদায় "চন্দ্রমুখী" পাইত। ঐ বিধবা তাহাকে চন্দ্রমুখী বলিয়া ডাকিতেন। চন্দ্রমুখী সর্বদাই লেপ ও বালিশের উপরে শয়ন করিয়া ঘোঁড় ঘোঁড় করিত। একটি দিনের জন্য কাদাতে পা দেয় নাই, বৃষ্টিতে ভিজে নাই। বৃষ্টি আসিলে সে লেজটি গুটাইয়া পা দুখানি পাতিয়া ঘরের দ্বারে বসিয়া বৃষ্টি দেখিত ও মাঝে মাঝে গা, হাত, পা, চাটিত, জলের ত্রিসীমানায় যাইত না। চন্দ্রমুখীর রুচিটি নবাবের মতো হইয়াছিল। সে ছোটোলোকের মতো ডালভাত খাইতে পারিত না; কাঁটা নাক দিয়া শুঁকিত না; হয় দুধ, না হয় মাছ দিয়া ভাত খাইত; ভাত মাখিয়া না দিলে তাহা স্পর্শ করিত না। বিধবা নিজে মাছ খাইতেন না, কিন্তু চন্দ্রমুখীর জন্য ভালো ভালো মাছ কিনিয়া আনিতেন; সুতরাং চন্দ্রমুখী একলা ঘরের একলা মেয়ে; সেই সুবাদে মাছ একলাই খাইত। এই রূপে সুখে স্বচ্ছন্দে চন্দ্রমুখীর দিন যাইতেছিল; হঠাৎ বিধবাটির গুরুতর পীড়া হইয়া মৃত্যু হইল। সুতরাং চন্দ্রমুখী পরের হাতে পড়িল। আমাদের কর্তাবাবুটি বড়ো জানোয়ার ভক্ত; সুতরাং ঐ বিড়ালটিকে যত্ন করিয়া বাড়িতে আনিলেন। কিন্তু আনিয়া যেই উঠানে ছাড়িয়া দিলেন, ভাবিলেন ভুলো ও মহাবীরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন, অমনি চন্দ্রমুখীর আর এক মূর্তি ধরিল। ভুলো নিকটে আসিবামাত্র লেজ ফুলাইয়া ও গায়ের লোম খাড়া করিয়া দাঁড়াইল, পেমা নবাগত বন্ধুর সহিত কৌতুক চলিবে কিনা পরীক্ষা করিবামাত্র তাহাকে থাবা মারিল, এবং অন্য বিড়ালগুলিকে দেখিবামাত্র গর্জন করিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল।

গৃহস্বামী দেখিলেন বড়ো বিপদ; তাঁহার শান্তির সংসারে অশান্তি আসিল। ভাবিলেন সময়ে চন্দ্রমুখী একটু শিখিবে। দুই চারিদিন তাহাকে দূরে দূরে রাখিলেন; অনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু সে সঙ্গীদের সহিত মিশিতে চাহিল না। পেমা বালক, তাহার অগম্য স্থান বাড়িতে ছিল না। চন্দ্রমুখী কোন কোণে বা বিছানার পার্শ্বে শুইয়া আছে, পেমা সেখানে আসিত, আর চন্দ্রমুখী তাহাকে মারিয়া অপমান করিয়া তাড়াইত। গৃহস্থ মধ্যে মধ্যে সকলের খেলা দেখিবার জন্য সকলকে

ঘরের মধ্যে আনিতেন, তখন চন্দ্রমুখী জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইত এবং বাড়ির মধ্যে একপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিত।

ক্রমে চন্দ্রমুখীর আরও অনেক বিদ্যার প্রকাশ পাইল। একটি খাঁচাতে গৃহস্থের একটি পাখি ছিল, তিনি তাহাকে স্নান করাইয়া মধ্যে মধ্যে মাটিতে রৌদ্রে বসাইয়া রাখিতেন। চন্দ্রমুখী তাহাকে ধরিবার জন্য খাঁচার উপরে ঝাঁপ দিয়া পড়িত। গৃহস্থ দেখিয়া বলিতেন—হাঁ তাইতো কোন গুণ নাই, এটিতো বেশ আছে! চন্দ্রমুখীর দ্বিতীয় বিদ্যা চুরি করা। সে দুধের ঢাকা খুলিয়া মধ্যে মধ্যে চুরি করিয়া দুধ খাইত।

একদিন চন্দ্রমুখীর স্বার্থপরতার প্রতিফল ফলিল। সেই দিন গৃহস্থ খেলা করিবার জন্য ঘরের মধ্যে পশুগুলিকে আনিবামাত্র চন্দ্রমুখী জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। সেদিন তাহার এত অসহ্য হইল যে, সে এই বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক প্রতিবেশীর বাড়িতে যাইবে মনে করিল। কিন্তু যেই যাইবার জন্য পথে বাহির হইল অমনি তীরের বেগে এক বিলাতি কুকুর আসিয়া একেবারে তাহার ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল। সে কুকুরটি নিজের প্রভুর সহিত পথ দিয়া যাইতেছিল, সে বড়ো দুরন্ত। চন্দ্রমুখীর বিপদ-সূচক আর্তনাদ উঠিবামাত্র ভুলো গৃহের বাহিরে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু আসিয়া যখন দেখিল চন্দ্রমুখীকে বিলাপ করিতে, আর যেন তাহার উৎসাহ হইল না। সে নিজে বিলাতি কুকুর, গায়ে যথেষ্ট জোর ছিল, মনে করিলে চন্দ্রমুখীকে শত্রুপক্ষ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত, কিন্তু তাহার মনে সে উৎসাহ আর রহিল না। সে আসিয়া দেখিয়াই দূরে দাঁড়াইয়া রহিল ও আবার বাড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। গৃহস্বামী চন্দ্রমুখীর আর্তনাদ শুনিতে পান নাই; কেবল ভুলো হঠাৎ ছুটিয়া গেল কেন এই বলিয়া কারণ জানিবার জন্য দ্বারের দিকে যাইতেছিলেন, দেখিলেন, ভুলো ফিরিয়াছে, তখন তিনিও ফিরিলেন। অবশেষে চাকরেরা চন্দ্রমুখীর রক্তাক্ত মৃতদেহ আনিয়া উপস্থিত করিল। গৃহস্থ বড়ো একটা দুঃখিত হইলেন না, বলিলেন, স্বার্থপর, বিড়ালটা আচ্ছা সাজা পাইয়াছে। চন্দ্রমুখী যে মরিল তাহাতে কাহারও এক বিন্দু কষ্ট হইল, এরূপ বোধ হইল না। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল,—আচ্ছা যে ভুলো পেমাকে বাঁচাইবার জন্য বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছে, সে আজ কিছু বলিল না কেন? ভুলো মনে মনে ভাবিল, "যে আমাকে দেখিতে পারে না, তাহার জন্য মরিব কেন?"

এই তো গেল চন্দ্রমুখীর দশা। ভুলোর মৃত্যুশয্যার ছবি একবার দেখ। কিছুদিন পরে বেচারা ভুলোর কি এক প্রকার পীড়া হইল; আহার করিতে চায় না, সর্বদা বমন করে, যেখানে সেখানে শুইয়া থাকে; গায়ের লোমগুলি ঝরিয়া যাইতে লাগিল; পোকার কামড়ানিতে সর্বদা মাটিতে গা ঘষিত, বাড়ি সুদ্ধু সকলের অসুখ। পেমা আগে বুঝিতে পারে নাই, ভাবিয়াছিল বুঝি সুখ করিয়া শুইয়া আছে। কিন্তু শেষে যখন বুঝিল যে ভুলো পীড়িত, তখন কাছ ছাড়ে না, সর্বদা আসিয়া শুইয়া থাকে। মহাবীর বড়ো অপ্রসন্ন। গৃহস্বামীর তো কথাই নাই, তিনি স্বয়ং স্বহস্তে সাবান দিয়া ভুলোর গা পরিষ্কার করিয়া দেন; তাঁহার কন্যাগণ পোকা বাছিয়া দেয়; তাঁহার গৃহিণী ভুলোর মুখে চুম্বন করেন, বলেন—"বাপধন, তোমার কি হয়েছে? অমন করে পড়ে আছ কেন?" যে সময়ে ভুলোর প্রাণবায়ু দেহকে পরিত্যাগ করিল, তখনকার অবস্থা কি ভাব! সমুদায় পশুগুলি বিষণ্ণ বদনে চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়াছে, গৃহস্থের চক্ষে জলধারা বহিতেছে; বাটীতে ছেলেমেয়ে মরিলে বাটীর লোক যেমন কাঁদে তেমনি গৃহস্থের পত্নী ও কন্যাগণ কাঁদিতেছেন। স্বার্থপর চন্দ্রমুখীর মরণে কেহ একটি নিশ্বাসও ফেলে নাই; আজ ভুলোর মৃত্যুতে কত লোকের চক্ষে জল পড়িতেছে।

চন্দ্রমুখী ও ভুলো এই দুইজনের মধ্যে পাঠক পাঠিকাগণ কাহাকে অধিক ভালোবাসিলেন জানাইলে সুখী হইব।

তোতাকাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।'

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পাখিটাকে শিক্ষা দাও।'

২

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী?

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটো দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশবিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, 'শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ।' কেহ বলে, 'শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল!'

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনই পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, 'অল্প পুঁথির কর্ম নয়।'

ভাগিনা তখন পুঁথিলিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, 'সাবাস। বিদ্যা আর ধরে না।'

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া তখনই ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্যে ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, 'উন্নতি হইতেছে।'

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরো বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্দুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

৪

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, 'খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।'

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।'

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখনই ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

৫

শিক্ষা যে কী ভয়ঙ্কর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরী ভেরি দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন!'

মহারাজ বলিল, 'আশ্চর্য। শব্দ কম নয়।'

ভাগিনা বলিল, 'শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।'

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন, এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, 'মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি।'

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, 'ঐ যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।'

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, 'পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।'

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চিৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা-সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।